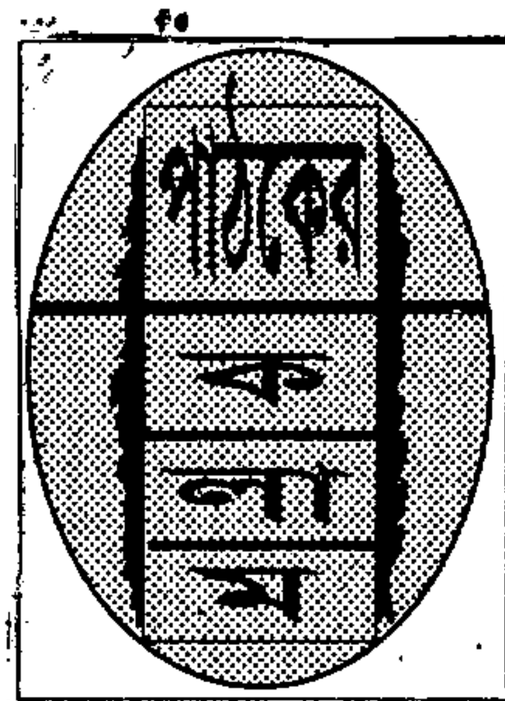

তারিখ 12 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

পাঠকের কলাম

নিরক্ষতা দূরীকরণই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত

স্বার্থক সাক্ষরতা বলতে দুনিয়ার শিক্ষাবিদরা একমত যে, ইহা সুপ্ত ক্ষমতার অবিরাম বিকাশ বা পরিস্ফুটন, এর ফলে ঘটতে থাকে ক্রমিক উন্নতি-বৃদ্ধি। এটি একটি জীবন প্রক্রিয়া। সাক্ষরতার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে যোগ্য নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা অর্জন। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অর্থবহ অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত হওয়া। এর তিনটি দিক রয়েছে (১) প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন; (২) প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো; (৩) জীবিকা অর্জনের দক্ষতা সৃষ্টি। এই দিবসে বিদ্যোৎসাহী সুধী জনগোষ্ঠীরা সারগর্ভ ভাষণ ও বক্তৃতা দিয়ে আসছেন। সরকারী ও বেসরকারী কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে ১৯৫১ সালে যে সাক্ষরতার হার ছিল ২১%, ১৯৭২ সালে তা বেড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ২২.০২%-এ অর্থাৎ এতো ডঙ্কা-নিনাদের পর সুদীর্ঘ ২৮ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছিল মাত্র ১.২%। ১৯৭৩ হতে ১৯৯৩ এই ২০ বৎসরে বর্তমানে হার ২৪.২০%। এ থেকে বিদ্যোৎসাহী এবং শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত পন্ডিতজন কি অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা নিয়েছেন, তা নিরপরাধ এবং নিরক্ষর জনগণ কখনোই জানতে পারেনি। সাক্ষরতা একটা বিশাল সমস্যা। এ পর্বত প্রমাণ সমস্যার সমাধান সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সকলের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার ইতিমধ্যে সম্ভাব্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাপক কর্মসূচী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার বেসরকারী সংস্থাসমূহের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং সহযোগিতা প্রদান করেছেন। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে হলে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। শুধু বছর বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যায় না। নিরক্ষর জনগণকে সত্যিকার সাক্ষর করতে হলে সুচিন্তিত বাস্তব পরিকল্পনাসমূহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। উপর হতে খেয়ালখুশিমত সমস্যা সমাধানের নির্দেশ জারি না করে নীচের কর্মস্থলের সমস্যা চিহ্নিত করে তাহার সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সমাধানের পথ খুঁজে বের করাই হবে উত্তম উন্নয়ন কর্মপন্থা। দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন না কোন সমস্যা প্রায় প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ সমস্যা, টেবিল বেঞ্চ সমস্যা, বই সমস্যা, বই-খাতা-পেন্সিল সমস্যা এবং সর্বোপরি শিক্ষক সমস্যা ও স্কুল পরিচালনা প্রক্রিয়া। সমস্যাগুলোর বিভিন্নতা ও ব্যাপকতা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই বুঝা যাবে বাংলাদেশে এখনও প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা খুবই করুণ। মান বলতে কিছু নেই। তারপরও অভিভাবকরা যে সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন, এর জন্য তাহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত।

সারাবিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। এইজন্য উন্নত দেশগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন, সম্মান এবং সুষ্ঠু পরিচালনায় গুরুত্ব বেশী। আমাদের দেশেও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অযোগ্য লোকদের এখানে চাকুরি দেয়ায় তাদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিশু -কিশোরদের শিক্ষা এই ক্ষতিটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে শিক্ষা প্রশাসন। শিক্ষকরা সত্যিকারের উপযুক্ত কিনা, স্কুলে উপস্থিত হন কি হন না, পড়ান কি পড়ান না, তা ভালভাবে খোঁজ-খবরও রাখেন না। সুতরাং এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক স্তুরে যাবার পর যে ভাল করবে, এ আশা দুরাশা ছাড়া কিছু না। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যাপক নকল ও ফেলের পশ্চাতে মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশুনা ঘাটতি যে একটি কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার দুর্বলতা একটি মুখ্য কারণ।

বলাবাহুল্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ অবস্থা চলতে থাকলে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক বলে যতই ঘোষণা দেয়া হোক না কেন তা কখনো ফলপ্রসূ হবে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তাদের স্কুলে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু স্কুল ভবন, চেয়ার-টেবিল এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলেই যথেষ্ট হবে না। স্কুলে শিশু-কিশোররা যাতে শিক্ষায় আকৃষ্ট হয় তাহারও ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ কাজের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে অবশ্যই শিক্ষকদেরকে। শিশুরা স্কুলে না এলে অভিভাবকদের আর্থিক দন্ড দিবার যে আইন করা হয়েছে তাহা সত্যি হলেও তা হবে অন্যায়। কোন বাবা মা শুধু শুধু সন্তানদের স্কুলে পাঠাবে না। কারণ যেখানে দরিদ্র অভিভাবকরা সন্তানের মুখে ঠিকমত খাবার তুলে দিতে পারে না, তাকে জরিমানা বা অর্থদন্ড করা হলেই কি আর না করা হলেই বা কি। সরকার আরি একটি মস্ত বড় ভুল করছে বা করতে যাচ্ছেন সম্প্রতি, তা হলো বয়স্কদের শিক্ষা উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত না রাখা ইত্যাদি। বয়স্করা হলো বর্তমান গৃহ, পাড়া, গ্রাম, সমাজ এবং দেশ উন্নয়নকারক। তারাই হচ্ছেন সমাজকে রক্ষা করার একমাত্র দল বা গোষ্ঠী। তারা যদি নিরক্ষর হয়, অজ্ঞ হয় তাহলে তারা তাদের ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনদের কোনদিন স্কুলে পাঠাবার ইচ্ছা প্রকাশ করবে না। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক গতি ও তৎপরতা ভেঙ্গে পড়বে। দেশের জনগণকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কথা ঘোষণা করেছেন। এই কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ এবং এর জন্য অর্থ যোগানের ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন মহলের পরামর্শ নিচ্ছেন। অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম। এই সমস্ত সভা-সমিতি ওয়ার্কসপ-সিম্পোজিয়াম্ ইত্যাদিতে গণশিক্ষায় নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থাগুলিকে সম্পৃক্ত করা হলে বাস্তব সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় খুঁজে পাওয়ার একটা উত্তম প্রক্রিয়া। কারণ তাহারাই প্রকৃত মাঠের ভুক্তভোগীদের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে গণশিক্ষা কর্মসূচীতে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহের সহিত সহযোগিতাদানের জন্য এগিয়ে আসছেন। শোনা যায়, বাংলাদেশে সাড়ে চার হাজারের মত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নানা রকম কাজে লিপ্ত যাদের কার্যকারিতা এক রকমের নয়। এদের মধ্যে প্রধান যে কয়টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত আছেন এবং উল্লেখযোগ্য কাজ করছেন কিছুকাল আগে তাদের একটা বিস্তারিত জরিপ শিক্ষা মন্ত্রণালয় করেছিলেন। এদের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার ক্ষমতা এবং সৃজনধর্মী সফল কার্যকলাপের জন্য ফিডার স্কুল, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং খামার ও খামার বহির্ভূত বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচীতে এই সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নেয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। বেসরকারী পর্যায়ে এদের অনেকে এমন সব কাজ করতে পারেন যা সরকারীভাবে করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় নয়। উক্ত প্রক্রিয়া অনুকরণ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়বার ঋণের জন্য বাংলা বর্ণমালা ও ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখতে ও পড়তে পারতে হবে এবং তিন হাজার টাকার উর্ধ্বে ঋণের জন্য সহজ লেখাপড়া জানতে হবে। এই ধরনের নীতি সহজেই কাজের বিনিময়ে খাদ্য, গ্রুপ ফিডিং, বি,আর,ডি,বি প্রভৃতি প্রকল্পে সহজেই সংযোজিত করা সম্ভব। তবে বেসরকারী সংস্থাগুলো সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারেন গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। গ্রাম উন্নয়ন কমিটি প্রতিষ্ঠা করা, মহিলা, যুবক, ভূমিহীনভিত্তিক সংগঠন করা, গ্রামভিত্তিক জরিপ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করানো– যার মধ্যে শিক্ষা-সাক্ষরতা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলীর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীদের নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা ইত্যাদি। এই ধরনের কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রামবাসীদের নিজেদের হাতে নেয়া অত্যন্ত জরুরী তা "বটম আপ প্ল্যানিং"-এর তাগিদে বা উন্নয়নে অংশীদারদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যথার্থভাবে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় সম্পদ আহরণের জন্য দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূর করা ব্যতীত অন্ধকার থেকে আলোতে যাবার সেতু পার হওয়ার কোন বিকল্প নাই।

–সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া